জোবেদাকে বলে, 'বিশ্বেস নেই ওদের বিষদাঁতকে, নইলে ওরা তো ভালবাসে, জোবেদা' একথা বলে সাপের ঠোঁটে চুমো খায় সে; জোবেদা স্বামীর এই সাপটির প্রতি ভালোবাসা দেখে সাপটাকে হিংসে করত, একদিন সাপটাকে ছেড়ে দিলে সাপটা ফিরে এসে জোবেদাকে ছোবল দেয়। জোবেদা মারা যায়, শেখ সাপকে ছেড়ে দিয়ে বলে — 'শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই, জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।' এরপর সে ফকিরী নেয়, সাপ ও জোবেদার প্রতি সমানুভূতির পরিবেশসৃষ্টিতে অভাবনীয় সংযম ও আশ্চর্য কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারাশঙ্কর। 'কালাপাহাড়' গল্পে কালা পাহাড় মানুষের কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এক প্রেমিক; অন্যপক্ষে বিরোধিতায় সে ক্ষিপ্ত— মানবশক্তির বিদ্রোহী প্রতিস্পর্ধী, বড়চাষী রংলাল পছন্দসই গরু কিনতে গিয়ে ঘটনাচক্রে সে কিনে ফেলে দুটো অতিকায় মহিষ, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ, রোজ তাদের নদীর ধারে চরাতে নিয়ে যায়, দূরে চলে গেলে অবিকল মহিষের ডাক ডেকে ফিরিয়ে আনে। একদিন বাঘের আক্রমণে কুম্ভকর্ণ মারা গেল, কালা-পাহাড়ের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে রংলাল এক পাইকারের কাছে একে বিক্রি করলেও সে ফিরে আসে, শেষে এক জমিদারের পাইকার তাকে কিনলে সেই পাইকারের হাত থেকে গলার দড়ি ছিনিয়ে নিয়ে কালাপাহাড় রাস্তায় ছুটতে থাকে আর রংলালকে তার বিচিত্র স্বরে 'আঁ-আঁ-আঁ' শব্দে ডাকতে থাকে, শান্তিভঙ্গের কারণে পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। জীব-জগৎকে মানব-জগতের অন্তর্ভুক্ত করে, অভিন্ন করে তোলার আশ্চর্য কৌশল এইভাবেই তারাশঙ্কর উক্ত গল্পদুটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঙ. তারাশঙ্করের গল্পে বাৎসল্যের উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করবার মতো, বাৎসল্যের আকুতি কিংবা অপ্রাপ্তিতে অবরুদ্ধ বেদনা তাঁর একাধিক গল্পে সুন্দর শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'ফুলপদ্ম' গল্পে 'বেলে'র ছেলে জন্মের পরই মারা যায়, ওর স্বামী 'হারা' বেলেকে ছেড়ে চাকরী খুঁজতে চলে গিয়েছিল, পাঁচ মাস পর হারা বাড়ী ফিরছে, পিঠে বোঁচকা, হাতে রঙিন কাগজের বাক্স। তার মন মানছিল না। কতদিন পরে সে বেলেকে দেখবে, আর দেখবে একখানি কচিমুখ, শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কান্না কানে এল: 'ওরে আমার হীন ছেলে, এই পথে বসে কাঁদছিলি।' এক অদম্য কৌতূহলে সে শ্মশানের ভেতর গিয়ে দেখে এক ছিন্নবস্ত্র রুক্ষকেশা শীর্ণকঙ্কাল মেয়ে ঠিক যেন সদ্যমৃত ছেলেকে আদর করছে, চুম্বন করছে আর গান গাইছে। ~~এই দেখে~~ বেলের এই অবস্থা দেখে হারার 'সর্বশরীর অবশ হইয়া গেল, হাত হইতে কাগজের বাক্সটা পড়িয়া ডালা খুলিয়া গড়াইয়া পড়িল — রঙিন ছিটের কামিজ ছোট জামা, জরির টুপি, ঝুমঝুমি, কাগজের রূপার চুড়ি, কোমরের বিছে, অমনি আরও কি কি, হারা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, বেলে, বেলে।' পিতৃ মাতৃহৃদয়ের হাহাকার এ গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'মহাশ্যামলি' গল্পে মৃত সন্তানের জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটের পাশে বামুন-মেয়ে কুসুমের ঘর, কুসুম মাদুর বোনে। স্বামী কেনারাম চাটুজ্জে বাউন্ডুলে, তিন বছরের মেয়ে মহাশ্যামলি মারা যাবার পর সে এবার ওবার ঘুরে বেড়ায়, একদিন রাত্রে কেনারাম এল, কিন্তু কুসুমের সঙ্গে দেখা না করেই শ্মশানের কুকুরছানাটাকে কোলে নিয়ে শ্মশানে চলে গেল। শ্মশানপ্রহরী গৈরু খেতে বসলে কেনারাম শ্মশানচুল্লী তদারক করতে যায়, হরিশ্চন্দ্র পালা আওড়ায়, চিতার আলোয় গৈরু দেখে, চাটুজ্জের চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। গৈরুকে বলে, 'মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল গৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়'। সকালবেলা চাটুজ্জের ঘরের দাওয়ায় এল। শ্মশানে রাত কাটিয়েছে বলে স্নান না করে ঘরে ঢুকতে না চাইলে কুসুম হেসে বলে — 'মহাশ্যামলি ফুল ফুটেছে — খুকু গাছ পুঁতেছিল।' প্রবল প্রত্যাশায় কুসুম হেসে বলে — 'সে আবার আসবে', ব্যগ্র প্রতীক্ষাকাতর পিতামাতার অবরুদ্ধ হৃদয়-বেদনাকে তারাশঙ্কর শ্মশানের পটভূমিতে বিস্ময়করভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে এই গল্পটি তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত শোক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। এই গল্প তাঁর কন্যা বুলুর মৃত্যুশোকস্তব্ধ হবার পর লেখা। 'বাবু-রামের বাবুয়া' এবং 'মতিলাল' গল্প দুটিতে নিঃসন্তান বাবুরাম এবং মতিলালের সন্তান-বাৎসল্যের চিত্র নিদারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, একদিন হাসপাতালের ডাক্তারের কাছ থেকে একটা ছেলে পেয়ে বাবুরামের

~~৬. তারাশঙ্করের গল্পে জন্তু-বিশ্বের মহিমা বিচিত্র এবং বহুব্যাপক।~~

মন ভালো হয় গেল। ছেলেটার তিন চার বছর বয়সের সময় তার বাবা জোর করে তাকে নিয়ে গেল। মনে আঘাত পেয়ে বাবুরাম চলে এল বর্ধমান। সেখানে একটি ছেলেকে মানুষ করল, কিন্তু সে-ও একটু বড় হয়ে টাকাকড়ি চুরি করে পালাল। ~~আবার [illegible]~~ এর দুবছর পরে গল্পের বক্তা গ্রামে গিয়ে দেখল বাবুরাম ক্ষেপে গেছে। কারণ, এবারের ছেলেটাকেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাসখানেক পর বাবুরামের বৌ সুখীমার কোলে তোয়ালে জড়ানো একটি শিশু, এই যে বাৎসল্যের আবর্তসৃষ্টি, আবার মোহভঙ্গ, ক্ষেপে যাওয়া — এই পৌনঃপুনিকতার থেকে বুঝি তাদের আর মুক্তি নেই। 'মতিলাল' গল্পে কুৎসিত দর্শন মতিলাল ও তার বৌ ভুবন নিঃসন্তান, মতিলাল জন্তু-জানোয়ার সেজে বাচ্চাদের মজা দেখায়। বাবুদের ফুটফুটে ছেলে পার্বতী মতিলালকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হুকুমে, তার গ্রামের ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়, শিশুপ্রিয় মতিলালের কাছে এ আদেশ মর্মান্তিক, আঘাতের তীব্রতায় সে এই কথা ভেবে শঙ্কিত হল যে, তাদের কুৎসিত ছেলে হলে, সে-ও এইরকম দুঃখ ভোগ করবে। মতিলালের বাৎসল্যের চাপা বেদনা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

আজন্ম অর্থাৎ-ঐতিহ্যে লালিত, তাঁর পুত্রের লেখায় জানতে পারি, তিনি মায়ের কাছেই দীক্ষা নেন, 'সকালে উঠেই পুজোয় বসতেন, ইষ্টমন্ত্র জপে দেবতার নাম লিখে দিন শুরু করতেন।'[৪]

৮) ~~১৩.~~ তারাশঙ্করের গল্পে তন্ত্র ~~সাধনা~~ ধর্মের সাধনা বিচিত্র এবং বহুব্যাপক/। একেবারে আভিধানিক অর্থে অভিচার, এমন কি শব-সাধনাদির বীভৎস ছবিও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্পষ্টতায় চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে, 'ছলনাময়ী' গল্পটি এই শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য গল্প; শ্বশুরের কয়লাখনিতে ঠিকাদারের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সার্ভেয়ার কানাই চক্রবর্তী, কলিয়ারি অঞ্চলের পরিভাষায় কম্পাসবাবু যার নাম, — পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তন্ত্রাভিচারী অদ্ভুত চরিত্র ম্যানেজারের সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ম্যানেজার বলেছিলেন, "তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে, অমিয়বাবু, অদ্ভুত শক্তি।" — সেই শক্তির ছিটে-ফোঁটা আয়ত্তও করেছিলেন, যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, — নিজের হাতে বিচিত্র মধুর গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন ইচ্ছামত। কিন্তু ঐ সামান্যটুকু দিয়ে ছলনা করেছে তাকে ছলনাময়ী, — তাই দাম্পত্য-সংসার ফেলে উন্মাদের মতো ছুটে ফিরেছেন সেই অতুল সম্ভোগ-রসের মত্ত নেশায়", মুখে মুখে অমিয়কুমারের কাছে তান্ত্রিক সিদ্ধির স্বপ্ন-ছবি অঙ্কন করেছিলেন, — "সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপ, দুর্লভ বিলাস, শ্রেষ্ঠ আহার, ইচ্ছামাত্রে ক্রীতদাসীর মত সে জোগাবে, ... তাকে আয়ত্ত করতে হয়, জোর করে স্ববশে আনতে হয়, — নারীর মত — পৃথিবীর মত, তখনই সে হয় দাসী।"

প্রকৃতিকে স্ববশে আনতে ভয়ানক পণ করেছিল ম্যানেজার — কিন্তু ছলনাময়ীর উৎকট প্রতিশোধে দুঃসহ বীভৎস হয়েছে তার পরিণাম, উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ম্যানেজার, — পাগলের মতো পথে পথে ঘুরতো, ক্ষণে ক্ষণে নিজের হাতে নিজে কামড়ে রক্তস্রোত বইয়ে দিতো, এই পাগল অবস্থাতেই স্বীকার করেছিল ম্যানেজার, — বিলাস দুরিয়া কুলি দিয়ে গোপনে হত্যা করিয়েছিল সে-ই কানাই কম্পাসকে — যাকে মাত্র কদিন আগে ভালবেসে বিয়ে করেছিল তার নিজের মেয়ে। কারণ কম্পাসবাবুর দেহটি তান্ত্রিক শবাসন হবার পক্ষে ছিল সুলক্ষণযুক্ত। ছলনাময়ীর হাতে সেই বীভৎসতার চরম বিপর্যয় ঘটেছে দুঃসহ কদর্য, — অকল্পনীয়, তন্ত্রসাধনার এই বিকট চিত্র কল্পনা করাও কঠিন, আসলে তারাশঙ্করের গল্প-বিষয়ে তন্ত্রাভিচার-জনিত বীভৎসতা যেমন রূঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি যথার্থ-রূপায়ন ঘটেছে তন্ত্র-সাধকের শক্তি-সমুখ দৃঢ় কঠিন ব্যক্তিত্বের, 'রায়বাড়ি' গল্পের রাবণেশ্বর রায় যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, বস্তুত লোক-স্বভাবের আদিম অপরিশুদ্ধ মাংসল স্থূলতা ও নগ্নতার মধ্যে জীবনের সত্য-রসকে আহরণ করার সাধনাই তারাশঙ্করের সাহিত্য-ব্রতের মুখ্য প্রয়াস,

৯) কালীসাধক রাবণেশ্বর তার উদাত্ত কণ্ঠের 'তারা তারা' রব — 'তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ' ইত্যাদি অনুষ্ঠান গল্পের বলদর্পী সামন্ততান্ত্রিক উদগ্রতার মধ্যে রৌদ্ররসের এক নূতন উপাদান সঞ্চার করেছে।